সূচনা (মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য তথ্যের অপ্রতুলতা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রকে কঠিন করেছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস রচনার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন বা তারা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী না থাকায় ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণে যত্নবান হননি। তবে যে সমস্ত বিষয়গুলি তাঁদের কাছে অর্থবহ ও রক্ষণযোগ্য বলে মনে হত, সেগুলি তাঁরা সংরক্ষণ করতেন। এগুলির গুণমান যাই হোক না কেন, ঐতিহাসিকগণ আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা সেগুলি থেকে ইতিহাস রচনা ও তা পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিহাস রচনার এই উপাদানগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, (i) *প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান* এবং (ii) *সাহিত্যিক উপাদান*। সাহিত্যিক উপাদানকে ভাগ করা যায় দু'ভাগে – (i) *দেশী সাহিত্য* ও (ii) *বিদেশী সাহিত্য* বা বিদেশীদের বিবরণ। দেশীয় সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – *বৈদিক সাহিত্য*, *মহাকাব্য*, *ধর্মশাস্ত্রসমূহ* বা *স্মৃতিগ্রন্থ*, *পুরাণ*, *অর্থশাস্ত্রসমূহ*, *ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা*, *বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক রচনা*, *সৃজনশীল সাহিত্য*, *বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য* প্রভৃতি।)

ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাভাবনা সম্বলিত রচনা হওয়া সত্ত্বেও আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব 1500 থেকে 600 অব্দের মধ্যবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু তথ্য ও পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত। খ্রীষ্টপূর্ব 1500-1000 সময়কালে বৈদিক যুগের আদিপর্বে রচিত *ঋগ্বেদ*'-এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি পশুপালন ও কিছু পরিমাণ কৃষিকর্মের দ্বারা চিহ্নিত হওয়ায় ঋগ্বেদের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সহজতর অথচ অত্যন্ত প্রাণবন্ত সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। পরবর্তীকালের বৈদিক সাহিত্য যথা, *সাম*, *যজুঃ* ও *অথর্ববেদ* এবং *ব্রাহ্মণ সাহিত্য*, *আরণ্যক* ও *উপনিষদ*-এও রাজনৈতিক ঘটনাবলী কম হওয়া সত্ত্বেও তা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিশেষত ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জানতে বিশেষভাবে সহায়ক। এখান থেকেই জানা যায় যে, এই সকল ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের যুগের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জটিলতা কিভাবে বাড়তে শুরু করেছিল। এই সময় ব্রাহ্মণের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক্রমশঃ বাড়ছিল। পশুবলি নির্ভর জটিল আচার-অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞ সর্বস্বতা বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হলেও উপনিষদসমূহে ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল। তবে বৈদিক সাহিত্যের প্রধান সীমাবদ্ধতা হল তার রচনাকাল নিয়ে মতানৈক্য এবং এই সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সমর্থনে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অভাব।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম আধার হল *রামায়ণ* ও *মহাভারত* মহাকাব্যদুটি। বিতর্ক থাকলেও অনেকেই মনে করেন, অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত ও এক লক্ষ শ্লোক সম্বলিত *মহাভারত* রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব 500/400 থেকে খ্রীষ্টীয় 400/500 অব্দের মধ্যে প্রায় ৪00 থেকে 1000 বছর ধরে। *রামায়ণ* রচনা শুরু হয়েছিল আর একটু পরে, কিন্তু শেষ হয়েছিল সম্ভবত মহাভারতের পূর্বে। যদিও *রামায়ণ* 'আদিকাব্য' বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ দুই মহাকাব্যের বাস্তব রাজনৈতিক ভিত্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বাস্তবতা বা রামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা তর্কাতীত নয়। এই দুই মহাকাব্যই সম্ভবত বীরগাথা, যা চারণ কবিদের মুখে মুখে গীত হত। তাই অনেকের মতে, *মহাভারত* ও *রামায়ণ*-এর রচয়িতা যথাক্রমে *ব্যাসদেব* ও *বাল্মীকি* সম্ভবত রচয়িতা নন, সঙ্কলক। নানা সময়ে নানা বিষয় এতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে বীরগাথা পরিণত হয়েছিল ধর্মপুস্তক বা শাস্ত্রে। যেহেতু নির্দিষ্ট রচনাকাল পাওয়া যায় না, তাই কোনও নির্দিষ্ট কালপর্বকে *'মহাকাব্যের যুগ'* বলে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে এখান থেকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল চরিত্র এবং বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশের নির্ভরযোগ্য আলেখ্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির আয়তন বিশাল ও জটিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *মনু*-র ধর্মশাস্ত্র বা *মনুস্মৃতি*, *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*, *বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র*, *বৃহস্পতিস্মৃতি* এবং *নারদস্মৃতি*। এখান থেকে পাওয়া যায় সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন ও রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিবিধ উপদেশাবলী, প্রাচীন আমলের বর্ণ-জাতি ব্যবস্থা, বিবাহ প্রথা, নারীর সামাজিক অবস্থান দৈনন্দিন জীবনচর্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষি, কারিগরী শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাধারী ও বৃত্তিধারী সংগঠন বা গিল্ডের পরিচালনা প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি, মন্ত্রী-অমাত্য প্রভৃতিদের নিয়োগ, কর্তব্যকর্ম, রাজস্ব ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, গুপ্তচরদের কার্যবিধি, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ প্রভৃতি। পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রগুলির উপরে যে টীকাগুলি রচিত হয়েছে, সেখান থেকে জানা যায়, ধর্মশাস্ত্রগুলির ব্যাখ্যা কিভাবে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এর থেকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। তবে মনে রাখা দরকার, ধর্মশাস্ত্রের উপদেশাবলীতে ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই যেহেতু প্রধান



Scanned with CamScanner

লক্ষ্য, তাই এতে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেলেও বাস্তব অবস্থা অনেক সময়েই অনুপস্থিত থেকে যেতে পারে। সমকালীন লেখমালা, সৃজনশীল সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ প্রভৃতি থেকে প্রমাণ করা যায়, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি অলঙ্ঘনীয় ছিল না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল *বিষ্ণু, ভাগবত, কূর্ম, অগ্নি, বায়ু* প্রভৃতি *পুরাণ*। আঠারোটি *প্রধান পুরাণ*-এর রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে *বায়ু* ও *বিষ্ণুপুরাণ*-এর মতো কয়েকটি রচিত হয়েছিল গুপ্তযুগে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতক নাগাদ। আবার *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* রচিত হয়েছিল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতক নাগাদ। একটা সময় পণ্ডিত মহলে পুরাণের কদর না থাকলেও পরবর্তীকালে পুরাণ ইতিহাস চর্চায় সমাদৃত হয় বহু প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ থাকায়। যেমন, *অন্ধ্র* বা *অন্ধ্রভৃত্য* নামে উল্লিখিত সাতবাহনদের ইতিহাস চর্চায় পুরাণের সাহায্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক। যদিও পুরাণের সাহায্য এ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পুরাণকারেরা ঘটে যাওয়া অতীতকে ভবিষ্যতবাণীর আকারে বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় পুরাণগুলির আঞ্চলিক চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* নিঃসন্দেহে আদি-মধ্যযুগীয় বাংলায় রচিত। পশ্চিম ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায় *স্কন্দপুরাণ* থেকে। বর্তমানে যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত সেই সকল হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য পাওয়া যায় এই পুরাণগুলিতে। প্রাচীন ভারতীয় ভূখণ্ডের ধারণা পাওয়া যায় পুরাণগুলিতে, যেখানে *জম্বুদ্বীপ* বা *কুমারীদ্বীপ* তথা ভারতকে পাঁচ, সাত এমনকি নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে *হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী* মনে করেন, পুরাণে ভৌগোলিক ধারণার সঙ্গে মিশে আছে কবি-কল্পনাও।

ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত অথচ চরিত্রে কিছুটা পৃথক হল অর্থশাস্ত্র, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হল কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। এখানে ধর্মশাস্ত্রের তুলনায় রাজকীয় ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে রাজা তথা প্রশাসনের আর্থিক লাভক্ষতি ও সুবিধা-অসুবিধার উপর। কৌটিল্যের উপদেশাবলী ভাবালুতাবিহীন ও কঠোর বাস্তববোধসঞ্জাত, তাই চাতুরী ও শঠতার আশ্রয় নিতে রাজাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালের গ্রন্থকারদের উপর অর্থশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন, *কামন্দক* রচিত *নীতিসার* ও *সোমদেবসূরি*-র *নীতিবাক্যামৃতম্* গ্রন্থদুটি প্রায় অর্থশাস্ত্রের সারসংক্ষেপ।

অতীতের তথ্যনিষ্ঠ ঘটনাবলীর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়ার নজির প্রাচীন ভারতে খুব একটা নেই। বিখ্যাত রাজাদের সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক রচনার সংখ্যাই অধিক। যেমন, বাণভট্টের *হর্ষচরিত* থেকে জানা যায় *হর্ষবর্ধন* ও *পুষ্যভূতি* বংশের ইতিহাস। বিল্হনের *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* থেকে জানা যায় কর্ণাটকের পরবর্তী-চালুক্য বংশীয় রাজা *ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের* কীর্তিকাহিনী। বাংলার পালবংশীয় রামপালের কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে দ্ব্যর্থক ভাষায় রচিত হয়েছে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্*, যার প্রতিটি শ্লোকে একদিকে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের প্রশস্তি এবং আসলে তা পাল রাজা রামপালের কীর্তিকাহিনী। এখান থেকে *পাল*-দের আদি ইতিহাসেরও কিছু আভাস মেলে। ইতিহাসাশ্রয়ী রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্বাদশ শতকে *কলহণ* কর্তৃক রচিত *রাজতরঙ্গিনী*, যেখানে কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রাক-সপ্তম যুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে *কলহণ* জনশ্রুতির আশ্রয় নিলেও অষ্টম শতক থেকে তাঁর রচনা অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ ও নিস্পৃহ (রাগদ্বেষবিবর্জিতম্)। প্রশস্তির মূল দোষ অতিশয়োক্তি থেকে *কলহণ* অনেকাংশেই মুক্ত।

জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখা নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে *পাণিনি* রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ *অষ্টাধ্যায়ী*। তার উপর *পতঞ্জলির* বিখ্যাত টীকা *মহাভাষ্য* রচিত হয়েছিল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গোড়ায়। তামিল ব্যাকরণ *টোলকাপ্পিয়ম্*-ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে প্রণীত হয়েছিল অমর সিংহের *নামলিঙ্গানুশাসন*, যা *অমরকোশ* নামেও পরিচিত। এরই আদলে দ্বাদশ শতকে রচিত হয়েছিল হেমচন্দ্রের *দেশীনামমালা*। প্রাচীন গণিতবিদ্যার নিদর্শন মেলে আর্যভট্টের *আর্যভটীয়* এবং ব্রহ্মগুপ্তের *সূর্যসিদ্ধান্ত* গ্রন্থদুটিতে। বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতা* জ্যোতিষচর্চার ক্ষেত্রে, *চরকসংহিতা* ও *সুশ্রুতসংহিতা* শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে, *কৃষিপরাশর* কৃষি বিষয়ক ক্ষেত্রে, *বৃক্ষায়ুর্বেদ* নামক গ্রন্থ বৃক্ষবিদ্যার ক্ষেত্রে, সোমেশ্বর প্রণীত *মানসোল্লাস* গ্রন্থটি স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে *অষ্টাঙ্গহৃদয়* এবং চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কাব্য, নাটক, আখ্যানমূলক সৃজনশীল রচনা সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত না হয়ে থাকলেও সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে অস্বীকার করে রচিত হয়নি। যেমন, কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*, *মেঘদূতম্* প্রভৃতি নাটকসমূহ, *দণ্ডী*-র *দশকুমারচরিত*, *ভারবি*-র *কিরাতার্জুনীয়ম্*, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকম্* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালীন লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে পাল্টে গিয়েছিল, *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* থেকে তার বিশ্লেষণ করেছেন *রোমিলা থাপার*। প্রাচীন *সঙ্গম সাহিত্য* থেকেও সে সময়কার দাক্ষিণাত্যের সমাজচিত্রের পাশাপাশি জানা যায়, কিভাবে *চোল, চের, পাণ্ড্য* প্রভৃতি এলাকায় ধীরে ধীরে কৌম রাজনৈতিক সংগঠন থেকে দলপতির প্রাধান্য ও শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হচ্ছিল। প্রাচীন ভারতে নগরের উদ্ভব, বিকাশ ও অবক্ষয়কে বুঝতে গেলে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের পাশাপাশি জরুরি হয়ে পড়ে সাহিত্যিক উপাদানের বিশ্লেষণ।



Scanned with CamScanner

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি। বৌদ্ধ *ত্রিপিটক* এবং তার অন্তর্গত *নিকায়* গ্রন্থগুলি, জৈন সূত্রাবলী, জাতকের কাহিনী সমূহ, জৈন *আচারঙ্গসূত্র* বা *আবশ্যকচুর্ণী*-র মতো গ্রন্থ থেকে জানা যায় সমসাময়িক পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, বাণিজ্যপথ, বণিক সম্প্রদায় প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা তথ্য। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত*, বৌদ্ধগ্রন্থ *ললিতবিস্তার*, হেমচন্দ্রের *ত্রিষষ্ঠীশলাকাপুরুষচরিত*, জৈন *ভগবতীসূত্র*, সিংহলী ইতিবৃত্ত তথা *দ্বীপবংশ* ও *মহাবংশ*।

প্রাচীন ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহৃত বৈদেশিক সাহিত্যিক উপাদানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় – (i) গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা, (ii) চৈনিক বিবরণী এবং (iii) আরবী ও পারসিক ভাষায় রচনা। দেশীয় উপাদানের সীমাবদ্ধতাগুলিকে দূর করার জন্য অনেক সময়েই এই উপাদানগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিদেশীদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে এলেও সমস্যা হল, অনেকেই ভারতবর্ষকে চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করেননি। গ্রীক লেখক *হেরোডোটাস* তাঁর গ্রন্থ *'ইস্তোরিয়া" (History)*-তে প্রথম *ইন্দোয়' বা ইণ্ডিয়া'* শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। মৌর্য আমলের ইতিহাস জানার জন্য অপরিহার্য মেগাস্থিনিসের *ইণ্ডিকা*, যার মূল গ্রন্থটি বিলুপ্ত হলেও পরবর্তীকালের লেখক *ডিওডোরাস*, *স্ট্রাবো*, *আরিয়ান*, *জাস্টিন* প্রমুখের রচনায় নানা উদ্ধৃতির মধ্যে এটি বেঁচে আছে। রোম-ভারত বাণিজ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা *পেরিপ্লাস টেস এরিথ্রাস থ্যালাসেস*, *প্লিনি*-র *ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া*, *টলেমি*-র *জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস*। ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে *কসমাস ইণ্ডিকোপ্লয়েস্টেস* রচনা করেন *ক্রিশ্চিয়ান টপোগ্রাফি*। চৈনিক বিবরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য *হৌ-হান-সু*, *ছিয়েন-হান-সু*। এখান থেকে ভারতের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও কুষাণদের আদি ইতিহাস জানা যায়। এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি জানার জন্য উল্লেখযোগ্য *ফা-হিয়েন*, *হিউয়েন সাঙ* ও *ই-চিং*-এর রচনা। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে সমকালীন প্রচুর তথ্যাবলী পাওয়া যায়। অন্যান্য তথ্যসূত্রের সঙ্গে এগুলিকে তুলনা করেও অনেক কিছু জানা যায়।

নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে আরবী-ফারসী রচনায় ভারতের প্রসঙ্গ নিয়মিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে এই সময়কালকে সম্প্রতি *প্রাচীনযুগ* নামে চিহ্নিত করা হয় না, একে *আদি-মধ্যযুগ* প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তবে বলা যায়, 711 খ্রীষ্টাব্দে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণ জানা যায় *চাচনামা* এবং *অল বিলাদুরি*-র রচনা থেকে। এছাড়াও *সুলেমান*, *ইবন খুরদাদবা*, *অল মাসুদী*, *অল ইদ্রিসি* প্রভৃতি লেখকদের ভারত সংক্রান্ত বিবরণ বিশেষ উপযোগী। তবে তাঁরা অধিকাংশই পূর্বসূরীদের বর্ণনা থেকে বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এর ব্যতিক্রম হল *অল বিরুণী*-র *তহকিক-ই-হিন্দ* বা *কিতাব-উল-হিন্দ*। ইহুদী বণিকদের ব্যবসা সংক্রান্ত আইনী কাগজপত্রও সম্প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। *এস. ডি. গয়টেইন* এ বিষয়ে আজীবন গবেষণা করেছেন।

সাহিত্যিক উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলির দুর্বলতার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যিক উপাদান, তা বিবরণ বা গ্রন্থ যাই হোক না কেন, সততই পরিবর্তিত হয় বা তাতে অন্য অনেক তথ্য প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। অনেক সময় আদি গ্রন্থটি পাওয়া যায় না অথবা অনুবাদ বা অনুলেখনের সময় প্রকৃত ঘটনা বিকৃত হতে পারে। সমকালীন লেখক বা পর্যটক যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখেছেন, তার সঠিক প্রয়োগ নাও হতে পারে বা প্রকৃত ঘটনাও তা না হতে পারে। পর্যটকদের রচনায় সাধারণত সমাজের উঁচুতলার চিত্র পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিকভাবে সামাজিক চিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় তা উপযোগী হয় না। নাটক বা কাব্যসমূহে অনেক সময়েই কাল্পনিক ঘটনার মিশ্রণ ঘটে থাকার ফলে প্রকৃত তথ্য পাওয়া দুষ্কর। সভাকবিদের বর্ণনা অনেক সময়েই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হত। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে প্রকৃত তথ্য অনেক সময়ে ঢাকা পড়ে যেত। পর্যটকদের পক্ষেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সামগ্রিক চিত্র প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হত না। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনের ফলে বর্ণনাগুলি কখনোই নির্মোহ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হত না। যেমন, মেগাস্থিনিসের রচনায় ভারতে দাসপ্রথার প্রসঙ্গ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কিন্তু প্রকৃতিক কারণে নষ্ট হওয়া ছাড়া অবিকৃত থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সাধারণত ভুল তথ্য পরিবেশন করে না। প্রত্নবস্তু সরাসরি যে আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরে তা সাহিত্যিক উপাদান তুলে ধরতে অপারগ। সুতরাং সেদিক থেকেও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় কোনও ধরণের উপাদানকেই পুরোপুরি অবহেলা করা যায় না।

Scanned with CamScanner